দৈনিক ইত্তেফাক

তারিখ 27 SEP 1993
পৃষ্ঠা 2 কলাম 4

ঘরে-বাইরে

—সন্ধানী

শিক্ষা প্রতিমন্ত্রী বলেছেন, 'সবার জন্য শিক্ষা' নিশ্চিতকরতে সরকার 'দৃঢ় প্রতিজ্ঞ'। তিনি কোন সময় সীমা নির্দিষ্ট করেননি। তবে মন্ত্রী ২০০৩ সাল নাগাদ লক্ষ্য অর্জিত হবে বলে জানিয়েছেন। ২০০৩ সাল আসতে আর মাত্র ১০ বছর বাকী। দেখতে না দেখতে সময়টা কেটে যাবে। এর পর আর কোন নিরক্ষর থাকবে না ভাবতেও আনন্দ লাগে। গভীর প্রশান্তিতে মন ভরে যায়। কেননা, শিক্ষার অভাব নানা কুসংস্কার জন্ম দেয়। মেধাশক্তি বিকাশে অন্তরায় সৃষ্টি করে। পক্ষান্তরে, শিক্ষা জীবনের অন্ধকার দূর করে। জীবন-যুদ্ধে জয়ী হওয়ার শক্তি যোগায়। বিশ্বের যেসব দেশ ধনী ও মানী সেসব দেশ শিক্ষায় অগ্রসর। প্রতীচ্য তো বটেই—প্রাচ্যেও এর নিদর্শন প্রচুর। জাপানে শিক্ষিতের হার শতকরা ৯০ জন। থাইল্যাণ্ড, সিঙ্গাপুর, শ্রীলংকা, ভিয়েতনাম ও মালদ্বীপে সাক্ষর-জ্ঞানসম্পন্ন লোকসংখ্যা শতকরা ৮৫ থেকে ৯৫ জন। চীন, মালয়েশিয়া ও ইন্দোনেশিয়ায় ৭০ থেকে ৮৫ ভাগ। ভারতে শতকরা ৪৭ জন। আর বাংলাদেশে এক হিসাবে শতকরা ২৭ জন, অন্য হিসাবে ৩০ জন।

সাক্ষর-জ্ঞান ও শিক্ষিত শব্দ দুটোর মধ্যে অনেক প্রভেদ। শিক্ষিত ব্যক্তি দেশী-বিদেশী জ্ঞান-ভাণ্ডার মন্থন করে প্রতিভা বিকশিত করতে পারে। অবদান রাখতে পারে দেশ ও সভ্যতার বিকাশে। কিন্তু সাক্ষর-জ্ঞানসম্পন্ন ব্যক্তি নাম দস্তখত এবং বানান করে দু'-একটি মোটা অক্ষরের বই পড়া এবং ছোটখাটো চিঠি-পত্র লেখা ছাড়া কিছু পারে না। তাই সাক্ষর-জ্ঞানসম্পন্ন ব্যক্তির পক্ষে শিক্ষিতজনের মত অবদান রাখা সম্ভব নয়। তবু এর উপকারিতা প্রশ্নাতীত। কেননা, এর ফলে সে আগুন-পানি চিনতে সক্ষম হয়। নিজের সাথে সাথে সমাজকে কিছু দিতে পারে। আমাদের দেশে এ শ্রেণীর লোকসংখ্যাও শতকরা ২৭ থেকে ৩০ জন। কর্তৃপক্ষ বাকী ৭০ থেকে ৭৩ জনকে অক্ষর-জ্ঞান দিতে 'দৃঢ় প্রতিজ্ঞ'। এ দৃঢ় প্রতিজ্ঞার প্রশ্নে কোন সংশয় প্রকাশ করছি না। তবে একটি তথ্য উল্লেখ করছি। 'নিজেরা শিখি' নামক একটি বেসরকারী সংগঠনের জরিপে বলা হয়েছে যে, দেশে নিরক্ষর জনসংখ্যা প্রায় ৯ কোটি। এর সাথে প্রতি বছর যোগ হচ্ছে ২৫ লাখ। অর্থাৎ দৈনিক ৫ হাজার। কি করে যোগ হচ্ছে জরিপে এর ব্যাখ্যা নেই। তবে একটু চিন্তা করলে বোঝা যায়। প্রতি বছর দেশে জন্ম নিচ্ছে ৩৫ লাখ নবজাত শিশু। অকালমৃত্যুর পর বেঁচে থাকছে তেইশ-চব্বিশ লাখ। পাঁচ বছর পিছন থেকে হিসাব করলে প্রতি বছর ২৫ লাখ শিশু স্কুলে যাওয়ার উপযোগী হয়। প্রয়োজন হয় তদনুকূল স্কুল প্রতিষ্ঠা, বই-পত্র ও সাজ-সরঞ্জামের। কিন্তু তা কি হচ্ছে? এক খবরে জানা যায়, গত দু'বছরে প্রায় আড়াই হাজার প্রাথমিক স্কুল বন্ধ বা অচল হয়ে গেছে। নতুন স্কুল তদস্থলে পাঁচ-দশটি প্রতিষ্ঠিত হয়েছে কি-না সন্দেহ। এ অবস্থায় ২০০৩ সাল নাগাদ সবার জন্য শিক্ষা কিভাবে নিশ্চিত হবে জানি না। আবার অবিশ্বাস করতেও সাহস পাই না। কোন মাজেজা থাকতেও পারে। কারণ জনাব তানভীর আহমদ সিদ্দিকী ইতিপূর্বে দেশবাসীকে জানিয়েছেন যে, বর্তমান সরকারের উপর আল্লাহর রহমত আছে।

২০০০ সাল নাগাদ সবার জন্য শিক্ষা জাতিসংঘের শ্লোগান। বিশ্বব্যাংক, এশীয় উন্নয়ন ব্যাংক, ইউনিসেফ ও ইউনেস্কো প্রভৃতি আন্তর্জাতিক প্রতিষ্ঠান এ লক্ষ্য হাসিল করার জন্য দেশে দেশে বিভিন্ন কর্মসূচী বাস্তবায়নের কাজ করছে। বাংলাদেশ এ কর্মসূচীর একটি স্বাক্ষরদাতা দেশ। সে সুবাদেই থাইল্যাণ্ড ও নিউইয়র্কে অনুষ্ঠিত বিশ্বশিক্ষা সম্মেলনে যোগ দেয়। একটি টাস্কফোর্স গঠন করে বিভিন্ন এন-জি-ও প্রতিষ্ঠানকে যুক্ত করার মাধ্যমে উদ্যোগ গ্রহণ করে। সে উদ্যোগ বহু আগেই হুমড়ি খেয়ে পড়েছে। এর আগে '৯১ সালের মে' মাসে এরশাদ-সরকারের গণশিক্ষা কর্মসূচীর মেয়াদ শেষ হওয়ার পর একটি প্রচেষ্টা চালানো হয়। কিন্তু নতুন কর্মসূচী তৈরী করতে ১১ মাস পার হয়ে যায়। শেষ পর্যন্ত যা খাড়া করা হয় তা-ও সমুদ্রে গোষ্পদতুল্য। নয় কোটি নিরক্ষর লোকের মধ্যে মাত্র ৬৮ হাজারের ব্যবস্থা। ৪৩টি থানায় এ ব্যবস্থা চালু করা হয়। এরও মাঠ পর্যায়ে তদারকির কোন ব্যবস্থা নেই। গণমুখী শিক্ষা গমমুখী হয়ে পড়ায় কাজীর গরু হিসাবে আছে কিনা বলা মুশকিল। বস্তুতঃ দৃঢ়প্রতিজ্ঞা করা হলেও বাস্তবে বে-সরকারী এবং এন-জি-ও পর্যায়ের কিছু উদ্যোগ ছাড়া তেমন কোন প্রচেষ্টা নেই। এরা নিজেদের তত্ত্বাবধানে গণ-শিক্ষা কার্যক্রম চালিয়ে যাচ্ছে। প্রয়োজনানুগ না হলেও এদের কোন কোন উদ্যোগ বিশেষ তাৎপর্যমণ্ডিত ও বৈশিষ্ট্যপূর্ণ। যেমন, 'জীবন গড়ার নতুন পাঠ' নামক এসোসিয়েশন ফর সোশ্যাল এডভান্সমেন্ট বা আশার গণ-শিক্ষা কার্যক্রম। গণশিক্ষা বা সাক্ষরতা প্রধান কার্যক্রমের মাধ্যমে, আগেই বলেছি, ঐ ধরনের শিক্ষা দেওয়া সম্ভব নয় যা সৃষ্টিশীল প্রতিভার পরিপূর্ণ বিকাশ ঘটাতে সক্ষম। এ পদ্ধতিতে ব্যক্তির জীবন বোধের উন্নতি এবং মোটামুটি ভালভাবে বেঁচে থাকার সুযোগই কেবল সৃষ্টি করা যেতে পারে এবং তা যদি যায় তাহলে সমাজও উন্নত হবে এজন্য যে ব্যক্তি নিয়েই সমষ্টি বা সমাজ। 'জীবন গড়ার নুতন পাঠ' কার্যক্রমের বৈশিষ্ট্য বাস্তবধর্মী এবং শুরুতেই চেতনা সৃষ্টির সহায়ক। মদন মোহন তর্কালঙ্কার রচিত আগের দিনের শিশু পাঠ্য পুস্তক ছিল প্রধানতঃ নীতি কথামূলক। 'সদা সত্য কথা বলিবে', 'দীনজনে দয়া কর' ইত্যাদি উপদেশ ছিল প্রধান। 'লেখা-পড়া করে যেই, গাড়ী-ঘোড়া চড়ে সেই'—প্রভৃতি থাকলেও তেমন প্রধান বক্তব্য ছিল না। শিশু পাঠ্য পুস্তকে এসব নীতিকথা সংযোজিত করার উদ্দেশ্য ছিল ছোটকাল থেকে সজ্জন করে তোলার প্রেরণা। হাল আমলের শিশু পাঠ্য বইয়ে নীতি কথা নেই—আবার বাস্তবের ইশারাও নেই। আছে 'ড্যাং ড্যাং ঠ্যাং ঠ্যাং' জাতীয় অর্থহীন বক্তব্য। আশা'র 'জীবন গড়ার নতুন পাঠ'ক্রমে নীতিকথা ও অর্থহীন বাক্যের স্থলে সংযোজিত হয়েছে গভীর অর্থবোধক রূঢ় বাস্তব। জীবন চলার পথে মানুষকে যেসব সমস্যা মোকাবিলা করতে হয় কিংবা মানুষের মর্যাদা নিয়ে বাঁচার জন্য যে অধিকার সচেতনতা আবশ্যক তাই তুলে ধরার চেষ্টা করা হচ্ছে এ পদ্ধতির মাধ্যমে। যেমন, অ-তে অজগর হয় না-বলে বলা হয়েছে 'অধিকার আদায়ের জন্য গণ-শিক্ষায় অংশ নিন।' 'অভাবে স্বভাব নষ্ট।' 'অভাব দূর করার জন্য কাজ করুন।' 'অপুষ্টির জন্য শিশুর শরীর বাড়ে না' ইত্যাদি। জীবন যুদ্ধে জয়ী হওয়ার জন্য প্রথম থেকেই এ ধরনের শিক্ষা জরুরী। গণ-শিক্ষার ক্ষেত্রে আরও বেশী জরুরী এজন্য যে, গণ-শিক্ষায় অংশগ্রহণকারীদের সকলে শিশু-কিশোর নয়—পরিণত বয়স্কও অনেক। এর মাধ্যমে যে ধরনের শিক্ষার আয়োজন এতে পরিপর্ণ বিকাশের সুযোগ সীমিত। কঠিন বাস্তবের সাথে যুদ্ধ করার শক্তি প্রদানই এর প্রেরণা। তাই গণশিক্ষার পদ্ধতি এবং ধরন সনাতন বা প্রচলিত শিক্ষা থেকে স্বতন্ত্র হওয়া বাঞ্ছনীয়। ছোট-খাটো খামার, ব্যবসা-বাণিজ্য প্রভৃতিসহ অন্যান্য কাজ করে কিভাবে আর্থিক অনটনের অভিশাপমুক্ত থাকা যায় সে সম্পর্কে জ্ঞানদানের মধ্যেই এর সাফল্য নিহিত। আশা প্রায় ১০ হাজার কেন্দ্রে এ ধরনের শিক্ষা চালিয়ে যাচ্ছে। প্রাথমিক পর্যায়ের বই দেওয়া হচ্ছে বিনা-পয়সায়। কিশোর এবং বয়স্ক শিক্ষার্থীদের টিউশন ফি দিতে হয় না। এক পরিসংখ্যান থেকে জানা যায় যে, প্রতিষ্ঠানটির বিভিন্ন কেন্দ্রের শিক্ষার্থী সংখ্যা প্রায় এক লক্ষ। বেশীরভাগ নারী। এবং বার্ষিক ব্যয় এক কোটি টাকার অধিক। এর পাশাপাশি ভিক্ষুকের হাতকে কর্মীর হাতিয়ারে পরিণত করে আর্থিক সচ্ছলতা প্রদানের জন্য দেওয়া হচ্ছে বিভিন্ন প্রশিক্ষণ। জন্মশাসন সম্পর্কে সচেতন করে তোলা এর আর একটি বড় প্রয়াস। এছাড়া বিগত বছরসমূহে সংস্থার সদস্য-সদস্যাদের মধ্যে সঞ্চয়ী মনোভাব কতোটা সার্থকভাবে গড়ে তোলা হয়েছে বিভিন্ন প্রকল্পে তাদের অংশীদারিত্ব এর প্রমাণ। প্রতিষ্ঠানটির বহু প্রকল্প এখন অত্যন্ত জনপ্রিয় ও স্ব-নির্ভর। সদস্য-সদস্যারা এতোই সচেতন যে, আজকের কাজ আগামীকালের জন্য ফেলে রাখে না। গৃহীত ঋণ যথাসময়ে পরিশোধ করে দেয়। নিয়মিত সভা করে ভবিষ্যৎ পরিকল্পনা গ্রহণ করে। যথাসময়ে প্রশিক্ষণ কেন্দ্রে হাজির হয়। নন্ গভর্নমেন্ট অর্গানাইজেশনের ক্ষেত্রে যদি এ রকম হতে পারে তাহলে প্রেরণা সৃষ্টি করা গেলে সরকারী গণশিক্ষা বা ভিন্ন ক্ষেত্রে এর ব্যতিক্রম হতে পারে না। কিন্তু তা কি হচ্ছে? সদ্য প্রকাশিত এক খবর থেকে জানা যায় যে, বিভিন্ন স্থানে ৪০টি বয়স্ক শিক্ষা কেন্দ্র বন্ধ হয়ে গেছে। এর মূল উপকরণের অভাব। প্রয়োজনীয় আনুকূল্যে ঘাটতি। এ অবস্থা যদি বহাল থাকে তাহলে ২০০৩ সাল পরের কথা, ৩০০৩ সালেও লক্ষ্য অর্জিত হবে কি?